রবিশঙ্কর

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল বারাণসীতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সেতারবাদক রবিশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম হলো রবীন্দ্রশঙ্কর চৌধুরী। পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন আইনজীবী ও সংস্কৃত পণ্ডিত। যশোহরের নড়াইল জেলার কালিয়াতে তাঁদের আদি বাড়ি ছিল। শ্যামশঙ্করের ছিল ৪টি পুত্র। উদয়শঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর ও রবীন্দ্রশঙ্কর। পিতা শ্যামশঙ্কর তাঁর পরিবারের সকলকে ছেড়ে একদিন বিলাতে গিয়েছিলেন এবং পুনরায় বিবাহ করে সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র ও রবীন্দ্রকে নিয়ে ১০ বৎসর বারাণসীতেই ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুত্রদের নিয়ে খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়শঙ্করের কাছে প্যারিসে গিয়েছিলেন।

প্যারিসে গিয়ে ছোট্ট রবি দাদার নৃত্যের দলে যোগ দিয়েছিলেন। নৃত্যচর্চার

সংগে তিনি সেতার ও সরোদ শিক্ষাও শুরু করেছিলেন। মাত্র ১০ বৎসর বয়স থেকেই বড়দাদা উদয়শঙ্করকে তিনি একাধারে পিতা, বন্ধু ও গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রথম শিক্ষা ছিল তাঁর বড়দাদার কাছে। সুর, লয়, রাগ সবকিছুর প্রতি অসম্ভব টান এসেছিল দাদারই অনুপ্রেরণায়। "উদয়শঙ্কর কোম্পানি আফ হিন্দু ড্যানসার্স অ্যান্ড মিউজিসিয়ান্স" নামে একটি কেন্দ্র চালু হয়েছিল প্যারিসের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে। এই কেন্দ্রের সদস্য ছিলেন রবিশঙ্কর সহ ৪ ভাই, তাঁদের কাকা কেদারশঙ্কর ও তাঁর কন্যা কনকলতা, মাতুল ব্রজবিহারী, তিমিরবরণ, অন্নদা ভট্টাচার্য প্রমুখগণ। প্রায় সবসময়ই ঐ বাড়িতে চলত রিহার্সাল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নৃত্য ছেড়ে দিয়ে প্যারিস থেকে মধ্যভারতের মাইহার-এ গিয়েছিলেন। এখানে তিনি বিখ্যাত সরোদবাদক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ-কে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। একটানা ৭ বৎসর খাঁ সাহেবের কাছে সেতারের তালিম নিয়ে তিনি সহজেই সেতার বাদনে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। পরে গুরুর অনুমত্যানুসারে রবীশঙ্কর জনসমুখে সেতার বাদন প্রদর্শন করেছিলেন এবং শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুরুকন্যা অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের সময় রবিশঙ্করের বয়স ছিল মাত্র ২১ বৎসর ও অন্নপূর্ণার ১৪ বৎসর। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের পুত্র শুভেন্দ্রশঙ্করের জন্ম হয়েছিল। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে অন্নপূর্ণাদেবীর সংগে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল। এরপরে রবীশঙ্কর-এর জীবনসঙ্গিনী হয়েছিলেন কমলাশাস্ত্রী। এই সংগ বেশীদিন স্থায়ী হয়েছিল না। তাঁর পরবর্তী জীবন সঙ্গিনী হয়েছিলেন আমেরিকান কনসার্ট প্রযোজক সুজোনস। এঁদের কন্যা হলেন নোরা জোনস। পরে তিনি বিবাহ করেছিলেন সুকন্যা রাজনকে। এঁদের কন্যা হলেন অনুষ্কা।

রবিশঙ্কর সেনিয়া মাইহার ঘরাণার শিষ্য হলেও নির্দিষ্ট কোন ঘরাণাতেই তিনি বদ্ধ ছিলেন না। সব ঘরাণার ভাল অংশটুকু গ্রহণ করে নিজের পরিবেশনকে সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। সুরবাহারের কায়দায় লরজের তারযুক্ত সেতার তিনি বাজাতেন। এছাড়া নিজস্ব কায়দায় খাদের ২টি তারে বীণ অংগের কাজ করতেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর দেওয়া শিক্ষায় গৎকারিতে ছন্দবৈচিত্র ও লয়কারি, তেহাই দিয়ে তিনি সেতারের বিলম্বিত গৎ অংশকে শ্রুতিমধুর করে তুলতেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর সৃজনী ক্ষমতায় ছন্দ ও লয়কারিতে কর্ণাটকী ছন্দ ও লয়ের ছায়া নিয়ে বিভিন্ন তালে নতুন রূপ দিয়ে বাজাতেন। এই বিভিন্ন তালে সেতারে ও সরোদে যে লয়কারি ও ছন্দের প্রয়োগ বর্তমানে প্রচলিত তার উৎস রবিশঙ্কর তথা আলাউদ্দীনের বাজ।

রবিশঙ্কর ছিলেন একজন সফল রাগস্রষ্টা। তাঁর সৃষ্ট বহু রাগের মধ্যে নটভৈরব ও বৈরাগী রাগ ২টি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই দুটি রাগ সব ঘরাণার ওস্তাদরা যেমন পরিবেশন করেন তেমন বহু মানুষ আছেন যাদের কাছে রাগটির স্রষ্টার নাম অজানা এবং অবিশ্বাস্য। বহু প্রচলিত বলে অনেকেই রাগ দুটিকে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ বলেই মনে করেন। এখানেই স্রষ্টার সার্থকতা। তাঁর অন্যান্য রাগগুলির মধ্যে তিলকশ্যাম (তিলককামোদ ও শ্যামকল্যাণ), কৌশী তোড়ী (মালকোষ ও তোড়ী), বৈরাগী তোড়ী (বৈরাগী ও তোড়ী), মোহন কোষ, ইমন মাঝ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ঈশ্বরী শব্দ জুড়ে, তিনি বহু রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন — পরমেশ্বরী (রাগটি বর্তমানে পরিবেশিত হয়), যোগেশ্বরী (যোগ ও রাগেশ্বরী) প্রভৃতি।

সেতার যন্ত্রটির গঠনেও তিনি পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর পছন্দের সেতারটিতে আঙ্গুর পাতা-ছাপ ও ফুল আঁকা থাকত। ৭টি মূল তার, খরজ পঞ্চম ও খরজের সা থাকতেই হবে। তরফের তার থাকত ১৩টি। ওপরে থাকত ছোট তুম্বা। রুদ্রবীণার আদলে ষড়জ ও পঞ্চমে মোটা তার থাকতো। সেতারে ন্যাচারাল পালিশই তিনি পছন্দ করতেন। বাজনার শেষদিকে তবলার সংগে গৎ বাজাবার জন্য সেতারে ২টি হুক লাগিয়ে নিতেন। বর্তমানেও এই হুক্ লাগবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দেশে বিদেশে তিনি বহু ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করে গেছেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রবিশঙ্কর বিদেশে থাকতে শুরু করেছিলেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। মার্কিন বেহালাবাদক ইহুদি মেনুহিনের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করে ২ জন সুরকার তৈরি করেছিলেন

অ্যালবাম ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়েস্ট মিট্স ইস্ট'। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়েস্ট মিটস ইস্ট ভল্যুম টু' এবং 'ইমপ্রোভাইজেশনস, ইস্ট মিটস ওয়েস্ট।'

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে রবিশঙ্করের সংগে পরিচয় হয়েছিল বিটলস-এর লিড গিটারিস্ট জর্জ হ্যারিসনের সংগে। হ্যারিসন রবিশঙ্করের বাদন ক্রিয়া প্রভাবিত

হয়ে নিজের বাড়িতেই রবিশঙ্করের কাছে সেতার শিক্ষা শুরু করেছিলেন। এরপরে বিভিন্ন ব্যান্ডে তাঁর সেতার ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মনটেরে আন্তর্জাতিক পপ উৎসবে রবিশঙ্কর ৪ ঘণ্টা সেতার বাজিয়েছিলেন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উডস্টক উৎসবেও তিনি সেতার বাজিয়েছিলেন। ১৯৭১. খ্রীষ্টাব্দে হ্যারিসনের উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আল্লারাখা ও আলিআকবরের সংগে রবিশঙ্কর সেতার বাজিয়েছিলেন। এইভাবে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, পরশপাথর, কাবুলিওয়ালা, গুলজারের মীরা, হৃষিকেশ মুখার্জীর অনুরাধা, জোনাথন মিলারের অ্যালিসইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড, রিচার্ড অ্যাটেনবরোর গান্ধী প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য ছিলেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রবিশঙ্কর গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের আন্ধেরিতে। সেখানে তাঁর সুর দেওয়া গান "সারে জাহাঁ সে আচ্ছা' গানটি গাওয়া হয়েছিল। সুরটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে স্বাধীনতার পরে সেনাবাহিনীতেও ঐ গানটি গ্রহণ করা হয়েছিল। 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির সুরের পরে এই গানটির সুরই সারাদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে রবিশঙ্কর দূরদর্শনের 'সিগনেচার টিউন' 'সারে জাহা সে আচ্ছা'-র প্রথম লাইনের সুর তৈরি করেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবিশঙ্কর 'মোহনকোষ' রাগটি সৃষ্টি করেছিলেন।

আমেরিকান 'অ্যাকাদেমি আফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স'-এর তিনি সাম্মানিক সদস্য ছিলেন।

রবিশঙ্কর পদ্মভূষণ, দেশিকোত্তম ও ম্যাগসাই সাই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

তিনি ৩টি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

জাপানের সর্বোত্তম পুরস্কার 'দ্য ফুকুওকা এশিয়ান কালচার প্রাইজ' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল।

১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' দেওয়ায়

তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

২০০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড' দিয়েছিল ইন্ডিয়ান চেম্বার আফ কমার্স।

২০১২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর লা-জোলার ক্রিপস্ মেমোরিয়াল হাসপাতালে তাঁর হৃদযন্ত্রের ভালভ্ প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। ঐ অস্ত্রোপচার সহ্য করতে না পেরে হাসপাতালেই ১১ই ডিসেম্বর ২০১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বৎসর।

সারাজীবন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান থেকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতীয় সংগীতকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। তিনি হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সংগীতজ্ঞ। কিন্তু যশ, অর্থ, সম্মান সবকিছু পেয়েও জীবনের শেষ অবস্থাতেও রবিশঙ্কর সাধকের মত বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অবিরল চেষ্টা করে গেছেন।